নদী দূষণ

কামরুন-নাহার-মুকুল

নদী বাংলাদেশের প্রাণ। আর বাঙালির সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে নদীকেই কেন্দ্র করে। মিশরকে নীল নদের দান বলা হয়; তেমনি বাংলাদেশকে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা নদ-নদীর দান বলা যায়। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে অভিন্ন ৫৭টি নদী। নদী বিধৌত এ'দেশে ছোট-বড় মোট ২৩০টি নদী আছে আর শাখা-প্রশাখাসহ নদীর সংখ্যা প্রায় ৮০০টি। এ নদীগুলো সারাদেশে রক্তের শিরা-উপশিরার মতো বহমান। বিআইডব্লিউটিএর মতে, ১৯৭১ সালে দেশে প্রায় ২৪১৪০ কিলোমিটার জায়গা দখল করে ছিল নদ-নদী। আর বর্তমানে সেটি মাত্র ৬ হাজার কিলোমিটারে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটেও দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ প্রায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। নদীকে ঘিরেই ছিল আদিকালের যাতায়াতের সব ব্যবস্থা।

নদী পরিবেশের বিচিত্র অনুষঙ্গ। আমাদের দেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠির জীবন ও জীবিকার সম্পর্ক রয়েছে নদীর সাথে। খরস্রোতা নদীগুলোতে জেলেরা মাছ ধরত, নৌকাবাইচ হতো, উৎসবের আমেজে মেতে উঠত নদীর পাড়ের মানুষগুলো। কৃষি, মৎস্য, জেলেদের পেশা এবং সংস্কৃতির পাশাপাশি মানুষের নিত্যদিনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ সবকিছুর একমাত্র উৎস ছিল নদী। বাংলাদেশের নদীগুলোর বিচিত্র গড়ন, বিচিত্র চরিত্র। সিলেট অঞ্চলের নদীর সাথে রংপুরের তিস্তার মিল পাওয়া যাবে এমন নয়। নদী আপন বেগে পাগলপারা; নদী তার আপন গতিতে চলতে অভ্যস্ত। বাংলাদেশের নদীগুলো মিঠা পানির প্রধান উৎস্য এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু আমাদের দায়িত্বহীনতায় নদীগুলো দখল ও দূষণের শিকার। গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত সর্বত্রই ময়লা আবর্জনা নদীতে ফেলছি। উজান থেকে নেমে আসা পলিও এসে পড়ছে নদীতে। গঙ্গা,ব্রহ্মপুত্র,যমুনা এবং মেঘনা এই চার নদীর মিলিত নিষ্কাশন অববাহিকার আয়তন প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ বর্গ-কিলোমিটার। কিন্তু সেই নদী আজ দখল, দূষণ আর ভরাটের প্রতিযোগিতায় বিপন্ন; অনেকাংশে বিলুপ্ত। নদীগুলোর নাব্যতা হারানোর নানাবিধ কারণের মধ্যে অবৈধ দখলদারিত্ব, অপরিকল্পিত নদীশাসন, দূষণ, ভরাট, অপরিকল্পিত ড্রেজিং, ইচ্ছামতো বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি অন্যতম। বিশেষজ্ঞরা শিল্পবর্জ্য, পয়োবর্জ্য, শহরের কঠিনবর্জ্য এবং নৌযানের বর্জ্য এই চারটি উৎস্যকে নদীদূষনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সব নিয়মনীতি উপেক্ষা করে নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠছে বড় বড় কলকারখানা, শত শত বাঁধ। ঢাকার কোলঘেঁষা বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ আর বালু নদী রাজধানীর প্রান। দূষণ-দখলের কবল থেকে এ নদীগুলোকেও আর বাঁচানো যাচ্ছে না। প্রতিদিনই বাড়ছে দূষণ; বাড়ছে দখলদারদের সংখ্যাও। প্রভাবশালীরা নদী ভরাট করে দখলের উৎসবে মেতেছে।

৪শ' বছর আগে ঢাকার নগরায়ন শুরু হয়েছিল বুড়িগঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করে। যে নদীকে লন্ডনের টেমস নদীর সাথ তুলনা করা যেত। এটি রাজধানীর ফুসফুস হিসেবেও বিবেচিত হতো। আর আজ রাজধানীর প্রতিদিনের পয়ঃবর্জ্যের প্রায় সবটুকু উন্মুক্ত খাল, নদ-নদী, নর্দমা হয়ে অপরিশোধিত অবস্থায় বুড়িগঙ্গায় জমা হচ্ছে। বুড়িগঙ্গা নদীকে গিলে খাচ্ছে পলিথিন, ট্যানারিসহ শিল্প-কারখানার বিষাক্ত কেমিক্যাল ও বর্জ্য, হাসপাতাল-ক্লিনিকের পরিত্যক্ত কেমিক্যাল, লঞ্চ-জাহাজের পোড়া তেল, মবিল, ওয়াসার পয়ঃবর্জ্য, গৃহস্থালি বর্জ্য ও নদীর পাড়ে নির্মিত কাঁচা পায়খানা। ঢাকার প্রাণ বুড়িগঙ্গা এখন প্রাণহীন। স্বচ্ছ পানির কল কল শব্দ শোনা যায় না; দেখা যায় না তার বুকে সাপের ফনার মতো ঢেউ । এখন সে শীর্ণকায় ক্ষীণ স্রোতাস্বিনী; খরস্রোতা রূপ সে নব্বইয়ের দশকেই হারিয়েছে । এখন তার পানিও আর 'পানি'র সংজ্ঞায় পড়ে না; পরিণত হয়েছে বিষে; রং হয়েছে কালো কুচকুচে । মাছ বিলুপ্ত হয়েছে বহু আগে। জীব বৈচিত্রও নেই। এ নদীর পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রায় শূন্যের কোঠায়। বিশ্বব্যাংক বুড়িগঙ্গাকে মরানদী নামে ঘোষণা দিয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও প্রাণিবিজ্ঞানীদের মতে, মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী বসবাসের জন্য প্রতি লিটার পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ ৫ মিলিগ্রাম বা তার বেশি থাকা প্রয়োজন। অন্যদিকে দ্রবীভূত হাইড্রোজেনের মাত্রা কমপক্ষে ৭ মিলিগ্রাম থাকা উচিত। অথচ বুড়িগঙ্গা নদীর পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ মাত্র ২ মিলিগ্রামের মতো। এ অবস্থায় বুড়িগঙ্গায় প্রাণের অস্তিত্ব টিকে থাকার সুযোগ একেবারেই কম। আইন করেও ঠেকানো যাচ্ছে না বুড়িগঙ্গার দূষণ। কর্ণফুলী চট্টগ্রামের প্রান আর দেশের অর্থনীতির হৃদপিন্ড। দখল দূষনের শেষ নেই সে'নদীতেও। দু'পাড়ের কলকারখানার দূষিত বর্জ্য, পলিথিন, প্লাস্টিক ও রাবারের বিষে বিষাক্ত কর্ণফুলী। নদী দূষনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে জীববৈচিত্র ও জনজীবনে। ধংস হচ্ছে নদীর জীববৈচিত্র, হারিয়ে যাচ্ছে অনেক মাছ ও জলজপ্রাণী। বিজ্ঞানীদের মতে, দূষনের বিষ খাদ্যচক্রের মাধ্যমে মানব শরীরে প্রবেশ করছে। কিডনি বিকল, ক্যান্সারসহ নানাবিধ মরণব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ। নদী দূষণের কারণে মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আজ বাংলাদেশের নদীগুলো অস্তিত্ব সংকটে; ক্রমাগত নাব্যতা হারাচ্ছে । অনেক ছোট ছোট নদী বিলুপ্ত হবার পথে। মানুষের অনিয়ন্ত্রিত কর্মকান্ডই মূলত নদী দূষনের কারণ। কৃষি জমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, কীটনাশক এসে মিশে যাচ্ছে নদীতে। নিকাশি ব্যবস্থার মাধ্যমে দূষিত হচ্ছে

নদী ও অন্যান্য জলাশয়। নদীতে গবাদী পশুর গোছল, মৃত পশুপাখি, পরিত্যাক্ত আবর্জনা নদীতে ছুড়ে ফেলাসহ , নদীর তীরে অস্বাস্থ্যকর পায়খানা থেকে মলমূত্র নদীতে মিশে যাচ্ছে । মানুষ নির্বিচারে নদীতে ফেলছে দূষিত পদার্থ, শিল্প-কারখানার বর্জ্য, গৃহস্থালীর বর্জ্য। মানবতাও উপেক্ষিত।

নদী জীবন্ত সত্তা, তারও প্রাণ আছে, আছে অনুভূতি এবং সেই অনুভূতির সঙ্গে মানুষেরও একাত্মতা রয়েছে, তা বহু আগেই উপলব্ধি করেছিলেন রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ। তার লেখায় নদীর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল। সেই লেখার অনেক বছর পরে, ২০১৯ সালে বাংলাদেশের উচ্চ আদালত রাজধানীর প্রতিবেশী তুরাগসহ দেশের সকল নদীকে 'লিভিং এনটিটি' বা 'জীবন্ত সত্তা' হিসেবে ঘোষণা করেন। অথার্ৎ দেশের নদীগুলো এখন থেকে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণির মতোই আইনি অধিকার পাবে। আদালতের রায় অনুযায়ী নদীগুলো এখন 'জুরিসটিক পারসন' বা 'লিগ্যাল পারসন'। এর মধ্য দিয়ে মানুষের মতো নদীরও মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং নদীকে হত্যা করার অর্থ হলো বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে হত্যা করা। আদালত স্পষ্ট করে বলেছেন, তুরাগ নদীসহ বাংলাদেশের সব নদীই মূল্যবান এবং সংবিধান, বিধিবদ্ধ আইন ও পাবলিক ট্রাস্ট মতবাদ দ্বারা সংরক্ষিত। নদী জীবন্ত সত্তা ; মানুষের মতো তারও অধিকার আছে। বিষয়টি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। কারণ বাংলাদেশকে 'নদীমাতৃক' বলা হয়। নদী মায়ের মতো; নদী মা হিসেবে স্বীকৃত। নদী দূষনও মাকে হত্যা করার সামিল।

নদী দূষনের উৎস একাধিক, দূষনরোধ ও তদারকি করার কর্তৃপক্ষও একাধিক। নদীর অবৈধ দখল আর পরিবেশ দূষণ ঠেকাতে আছে 'জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।' ২০১৯ সালে হাইকোর্ট কর্তৃক নদীকে জীবন্ত সত্তা ঘোষণা করে 'নদী রক্ষা কমিশনকে ' দেশের সব নদ-নদী-খালের আইনগত অভিভাবক হিসেবেও ঘোষণা দেয়। দেশের সব নদ-নদী-খাল-জলাশয় ও সমুদ্র সৈকতের সুরক্ষা এবং বহুমূখী উন্নয়নে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বাধ্য থাকবে বলেও রায়ে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও নদীরক্ষা কমিশনকে স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সবধরনের পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেয় আদালত। নদীকে 'জীবন্ত সত্তা' হিসেবে ঘোষণা করা যুগান্তকারী রায়টিও একটি মাইলফলক। তবে হাইকোর্টের সব নির্দেশনা যে উপেক্ষিত -তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। নদীর পানি প্রবাহ ঠিক রাখা, দূষণ মুক্ত রাখা এবং দখল রোধে জড়িত আছে ২৭টি মন্ত্রনালয় ও বিভাগ। এরপরেও নদী রক্ষা পাচ্ছে না । জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০২০ এর খসড়ায় বেশ কিছু কঠোর বিধান রাখা হয়েছে। তবে আইনটি পাস হওয়া এবং আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা না গেলে 'জীবন্ত সত্তা' নদীর বিষয়টি কেবল রায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। নদীকে 'জীবন্ত সত্তা' বলা হলেও সেই সত্তাকে হত্যার অপরাধে অপরাধীর কোনো শাস্তি আছে কি? সংবিধান বলছে, রাষ্ট্র জলাভূমির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করবেন। কিন্তু না করলে কী হবে? বস্তুত, দেশে নদীরক্ষার জন্য বা নদীকে দখল ও দূষণের হাত থেকে বাঁচানো এবং নদী হন্তারকদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য আলাদা কোনো আইন নেই। পরিবেশ সুরক্ষা আইন এবং জলাধার সুরক্ষা আইনে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু নির্দেশনা ও শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে।

নদী তীরবর্তী শিল্প কারখানাগুলোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকা, যত্রতত্র প্লাস্টিকের ব্যবহারসহ পৌরসভাগুলোর ময়লা নদীতে ফেলা দূষণের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এক সময় নদী কৃষিকাজ ও মাছ ধরার উৎস হলেও এখন তা শিল্পকারখানার বিষাক্ত বর্জ্যে সম্পূর্ণ ব্যবহার-অনুপযোগী। নদীগুলোর আগের রূপে ফিরিয়ে নিতে শিল্প কারখানা, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দিয়েছেন পরিবেশবিদরা। যে আইনগুলো আছে সেগুলো জরুরী প্রয়োগ; নৌপথকে সচল রাখতে নদীগুলোকে খনন, সব কারখানায় শিল্পবর্জ্য শোধনাগার (ইটিপি) নির্মানে সরকারকে অবিলম্বে উদ্যোগ নিতে হবে। নদী রক্ষায় পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততার ওপর জোর দিয়েছেন; প্রয়োজনে সামাজিক আন্দোলনও গড়ে তুলতে হবে।

বিবিসির সমীক্ষায় বাংলাদেশের ৪৩৫টি নদী হুমকির মুখে; ৫০ থেকে ৮০টি নদী বিপন্নতার শেষ প্রান্তে। গবেষকদের মতে, এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ২০৫০ সাল নাগাদ নদীমাতৃক বাংলাদেশের নাম শুধু ইতিহাসের পাতায় থাকবে। এখনই নদী দখলদারকে উচ্ছেদ করতে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। মাছের অন্যতম ভান্ডার মেঘনা নদীকে দূষনের হাত থেকে রক্ষা করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি বেঁচে থাকবে জেলেদের জীবিকা আহরণের উৎসটিও।

#

লেখক: কামরুন-নাহার-মুকুল

পিআইডি ফিচার